বিনয়ের সঙ্গে আড্ডা—২

প্রথম আলাপের দিনই তাঁর কাছে পত্রিকার জন্য কবিতা চেয়েছিলাম। একগুচ্ছ কবিতা হাতে তুলে দিয়ে বললেন 'পুরোটাই নিয়ে যাও।' কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে আড্ডার বাসনা নিয়ে উঠে আসি প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানে। একটু পরে হঠাৎই বলে ওঠেন : 'কবিতার কোনো মানে থাকে না—এটা সকলে বোঝে না। কোনো-কোনো কবিতার হয়ত মানে হয়—কাশীরাম দাশের মহাভারত যেমন। সেগুলিও কবিতা। কিন্তু পাঠের পর তোমার ভিতরে তো একটা অনুভূতি জাগে। সেই অনুভূতিই আসল। যেমন জীবনানন্দের কবিতা, এইরকম লেখার সাহস কোথায় কবিদের? এখনকার কাউকেই তেমন দুঃসাহসী হতে দেখি না? তবে শক্তি কিছুটা দুঃসাহস দেখিয়েছে। 'বজ্র হানো / জ্বালো কাষ্ঠে চিতা···' শক্তি পেরেছে, এইভাবে লাইনের পর লাইন ও লিখে যেতে পারে। অনেকটা লিখতে পারে।' টানা লিখে যাওয়া প্রসঙ্গে 'অজ্ঞানের অনুভূতিমালা'র কথা বলি। বিনয়দা মৃদু হেসে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। নিজের লেখালিখি নিয়ে কিছুই বলতে চাননি। অনেকটা স্মৃতিচারণার মতো বলে ওঠেন : 'ফিরে এসো, চাকা' তখন অনেকেই সম্ভবত বোঝেনি। সাহিত্যের কোনো পত্রিকায় নয়, 'ফিরে এসো, চাকা' নিয়ে প্রথম লেখা বেরোল স্টেটসম্যান পত্রিকায়। বাংলা ভাষার এক কবিতার বইয়ের নাম প্রথম বেরোল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাগজে।'

কথায়-কথায় আবার জীবনানন্দের কবিতার সরণী বেয়ে চলে যান নিজের জগতে, 'কবিতাপাঠে একপ্রকার ভাবান্তর হয়। এই ভাবান্তর হলেই পাঠের আনন্দ পাওয়া সম্ভব হয়। আনন্দ বেশি হলে কবিতাটিও আরো ভাল লাগে, মনে থেকে যায়, মুখস্থ হয়ে যায় নিজে নিজেই', বলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিছুটা আবৃত্তি করেন। তারপরে বলেন, 'তোমার বাড়িতে উপনিষদটা একটু দেখে নিও। উপনিষদও তো প্রাচীন কবিতা। প্রাচীন থেকে আধুনিক সমস্ত কবিতাই এই ভাবান্তর ঘটিয়ে দেয়। মহৎ কবিতার এটাই বৈশিষ্ট্য।'

আরো দীর্ঘ-আড্ডার বাসনা নিয়ে পরে একদিন গেলাম টেপ রেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে। বললাম : 'বিনয়দা, পত্রিকার জন্য যে কবিতাগুলি দিয়েছেন, সেগুলি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।'

বিনয় □ নিজের কবিতা বিষয়ে কিছুই বলব না আমি। বলা উচিত নয় আমার। তুমি কি কবিতা লেখ?

সঞ্জয় □ লেখার চেষ্টা করেছি এক সময়। এখন পারি না, আসে না···

বিনয় □ কবিতা রচনার এক পদ্ধতি আমি তোমাকে শিখিয়ে দিই। দেখ,

পার কিনা—

টেবিলের উপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে বই-কাগজ-কলম-মোমবাতি অ্যাশট্রে ইত্যাদি। বিনয়দা সেগুলি নাড়াচাড়া করতে থাকেন, বইটি খুলে দেখেন এবং মুখে মুখে তাঁর এই সমস্ত ক্রিয়ার একটা ছন্দোবদ্ধ বর্ণনাও দিতে থাকেন :

'...কলমটি পড়ে আছে টেবিলের কোণে
হাত দিয়ে কলমটি ধরি...
এই ভাবে আমি কবিতা রচনা করি
যাতে মৌলিকতা কবিতায় আসে
কারো কাব্য অনুসরণের চেষ্টা তো করিনি আমি
যা-যা ঘটে যা-যা করি তাই লিখি মাঝে-মাঝে।'

বিনয় □ এই পদ্ধতিতে যদি লিখে যাও, তাহলে কারো সঙ্গে মেলার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সঞ্জয় □ এই যে নিজে যা-যা করছেন সেগুলিই পয়ারে লিখে ফেলা ?

বিনয় □ পয়ার তো আমি মুখে-মুখে বলি। তিরিশ বছর ধরে পয়ার লিখেছি। ফলে পয়ারটি আমার নিজের জিনিস হয়ে গেছে। তারপরে শোনো—

'...এইভাবে কবিতায় যদি কেউ মৌলিকতা আনে
তবে তাতো বোধবহ নয়—
আমায় কবিতা প্রায় সঙ্গীহীন হবে
মৌলিক কবিতা লেখা নিজে করে তার পরে—
...
এখন হেমন্তকালে যেন ঐ সূর্যদেব আমার নিকটে তার বলবার আছে
তার ফলে রৌদ্রটুকু পাঠিয়েছে আমার দুয়ারে
আমি তাই ভেবে দেখি হে সূর্য তুমি তো আছ ভাল মনে হয়
আমার অবস্থা কিন্তু ক্রমে-ক্রমে ধীরে-ধীরে ভালই হয়েছে
এই বিশ্বে মহাবিশ্বে সীমাহীন এই শূন্যে বাস করি আমরা সকলে
পরস্পর যুক্তভাবে যদিও রয়েছি তবুও যুক্ত থাকা এবং পৃথক থাকা
ঐ যে গরুটি ঐ ঐখানে চরে ওর সঙ্গে আমরা সকলেই যুক্ত আছি
নানাভাবে

আবার বিযুক্ত আছি বলাও তো যায়
কারণ গরুটি হল ভিন্নপ্রকারের এক জীব আর আমরা তো
কেউ কেউ দেবতা বা কেউ বা মানুষ
এইভাবে পৃথিবীতে পৃথক-পৃথক হলেও জীবগুলি আছে
একটি গোয়ালে যেমন কুকুরেরা বিড়ালেরা থাকে তেমনি এখানে

পৃথিবী নামক এই গোয়ালটিতেই আমরা সকলে
মানুষ দেবতা দেবী পরমেশ্বরেরা এইখানে এই পৃথিবীতে
গোয়ালের মতো এই পৃথিবীতে বাস করি একত্রে সকলে।

শব্দ তৈরি করা আমার অন্যতম কাজ। যেমন, 'মনোলীনা'-এটি আমার সৃষ্টি করা শব্দ। 'প্রকৃত পক্ষে' শব্দটি তুমি সারাজীবনে বহুবার পড়েছে। 'প্রকৃত প্রস্তাবে' কোথাও পড়েছ ?

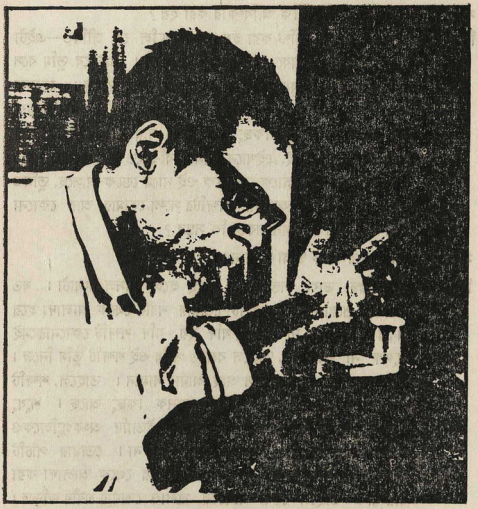

সঞ্জয় □ 'ফিরে এসো, চাকা'-র প্রথম কবিতায়—'দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ নীল জলে…'

বিনয় □ 'প্রকৃত প্রস্তাবে' শব্দটি আমিই প্রথম তৈরি করেছি। তারপরে চালু হয়ে গেছে বাংলা ভাষায়। অন্যদের লেখাতেও শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ শব্দটি গৃহীত হয়েছে বাংলাভাষায়। শব্দ তৈরি দুইভাবে হতে পারে। মধুসূদন লিখেছিলেন 'আরম্ভিল'। শব্দটি তৈরি

করেছেন মধুসূদন। তার বই মহামূল্যবান। মধুসূদনের জন্য ব্যাকরণের নতুন কিছু সূত্র লিখতে হয়েছে। 'আরম্ভিল' শব্দটি কীভাবে তৈরি হল, কী তার মানে—ইত্যাদি ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। বোঝ তাহলে!

শব্দ হল ব্রহ্ম। জীবিত। 'শব্দ ব্রহ্ম' তো পড়েছ, 'শব্দগুলি জীবিত' কোথাও পড়েছ তুমি? শব্দগুলি আসলে জীবিত। বুঝলে?

সঞ্জয় □ সেই জীবিত শব্দকে কি আবিষ্কার করা হয়?

বিনয় □ তৈরি করা হয়, সৃষ্টি করা হয়। শব্দগুলি যে জীবিত—এইটা প্রথমে তোমাকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। এই যে তুমি বসে আছ, তোমার নামবাচক শব্দটিও তোমার সঙ্গে রয়েছে। তোমার দেহ থেকে, তোমার শরীর থেকে ওই নামবাচক শব্দটিকে কি পৃথক করা সম্ভব? এমন কিছু কি করা যায় যাতে শব্দটি আর তোমার ভিতরে নেই, এইখানে আমার বাঁ-হাতে চলে এসেছে? গত তিরিশ বছর ধরে লোকে তোমাকে ওই নামে ডেকে আসছে, তুমিও সাড়া দিচ্ছ—এই অবস্থায় শব্দটির সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্পর্ক'ই রইল না এমন অবস্থা কি সম্ভব?

সঞ্জয় □ এটা আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়।

বিনয় □ ঠিক ধরেছ, ভাবা সম্ভব নয়। এই হচ্ছে আসল কথাটা। যত পদ্ধতিই প্রয়োগ করি শব্দটি তোমার শরীর থেকে আলাদা হয়ে অন্যত্র যেতে পারে না। তাই যদি হয়, যদি শব্দটি কোনোক্রমেই পৃথক না করা যায়, তাহলে বলতে পারি ওই শব্দটি তুমি নিজে। এই যে তুমি জীবিত বসে আছ আমার সামনে। তাহলে, শব্দটি আসলে জীবিত। এরকম আরো অনেক কিছু আছে। শুধু নামটাই নয়। এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি অঙ্কগুলিকেও তোমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তোমার পাঁচটি আঙুল। 'পাঁচ' শব্দটিকে তোমার হাতের থেকে আলাদা করা যায় না। তাহলে দেখ, গণিতের সঙ্গেও তোমার শরীর জড়িত। 'পাঁচ' হয়ে গেল জীবিত। এই হল কান্ডটা।

সঞ্জয় □ কবিতায় শব্দসৃষ্টিই তাহলে কবির কাজ—

বিনয় □ হ্যাঁ, কিন্তু সবাই পারে না। নতুন শব্দ সৃষ্টি করা এবং তাকে গৃহীত করা। পৃথিবীতে একহাজার বছর ধরে লোকে যদি শব্দটি পড়ে এবং বলে তাহলে বুঝতে হবে শব্দটি সত্যিই আছে। আমারও একটি কাজ হল শব্দ সৃষ্টি করা। 'মহাসহস্র' বলে একটি শব্দ

আমি সৃষ্টি করেছিলাম।

সঞ্জয় □ 'লক্ষাব্দী' শব্দটিও আপনার সৃষ্টি—

বিনয় □ হ্যাঁ, 'লক্ষাব্দী', 'মহাসহস্র' ইত্যাদি শব্দগুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরনো ব্যাকরণের নিয়মকেই অনুসরণ করা হয়েছে। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ যে সব শব্দ সৃষ্টি করেছেন তাতে পুরনো শব্দগুলিকে জুড়ে-জুড়েই নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। দেখ, জীবনানন্দ লিখেছেন—'আকাশলীনা'। শব্দটি আমরা মুখস্থ করেছি বটে, ছাপাও হচ্ছে, তার মানে শব্দটি সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু শব্দটি কেউ লেখে না। তেমনই 'মনোলীনা', 'মনস্' যোগ 'লীনা'। এবার 'তারাত্ব', 'চলত্ত্ব', 'গমত্ত্ব', আমার সৃষ্টি করা এই শব্দগুলির কথা ধরা যাক। 'চলৎ' যোগ 'ত্ব'—'চলত্ত্ব'—একটা জিনিস চলছে সেই অবস্থাটিকে বোঝানো হল। 'গমত্ত্ব' শব্দটি তৈরি করার সময় আমি ভীষণভাবে ভাবছিলাম—মোমেন্টামের বাংলা কী হবে।

ভবিষ্যতে কত ব্লকমের শব্দ বানাবার সুযোগ রয়েছে পৃথিবীতে ভাবো একবার। অসংখ্য শব্দ তৈরি হতে পারে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা করবে। এই যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের অভিধান তাতে একলক্ষ কুড়ি হাজার শব্দ রয়েছে। মানুষকে তা সৃষ্টি করতে হয়েছে। কিংবা কোনো সৃষ্টিকর্তা তা সৃষ্টি করেছেন। শব্দ সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থও তাতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু অর্থ নয়, তার শরীর তৈরি হয়ে গেছে। ইংরেজি ভাষাতে আছে সাড়ে চার লক্ষ শব্দ আর বঙ্গভাষাতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার শব্দ। তাও আবার কী-রকম—একটা গাছ বোঝাতেই লেগেছে পাঁচ-পাঁচটা শব্দ : গাছ, তরু, বৃক্ষ, মহীরুহ ও পাদপ। তাহলে তো একলক্ষ কুড়ি হাজারকে আমাদের পাঁচ দিয়ে ভাগ করে নিতে হয়। থাকে চব্বিশ হাজার শব্দ। তাহলে দেখ, বৃটিশ আর বাঙালিদের মধ্যে চিন্তার তফাত কতখানি। আমরা ভাবি চব্বিশ হাজার শব্দ দিয়ে আর ওরা ভাবে সাড়ে চার লক্ষ শব্দের সাহায্যে। এত শব্দ দিয়ে ওরা ভাবেটা কী সেটাও তো আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সেই জন্যই শব্দ তৈরি করা দরকার।

সঞ্জয় □ এই যে একই জিনিসকে আমরা নানা নামে ডাকি সেটা কি অপ্রয়োজনীয় ?

বিনয় □ অপ্রয়োজনীয় সে কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি লক্ষ-লক্ষ শব্দ তৈরি করার সুযোগ আছে।

'শব্দগুলি জীবিত'। এবং সেই জীবিত শব্দেরা শরীর ধারণ করে আছে। চিত্র-

কল্পের বর্ণনা নয়, যেন গার্ণিতিক কোনো অনুসিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে। যুক্তি স্থাপনের এই ঝোঁকে তিনি আপাতভাবে অর্থহীন শব্দের মধ্যেও খুঁজে পান জীবিত শরীর। টেবিলের উপরে পড়ে থাকা একটি পত্রিকায় ছাপা তাঁর রচিত একটি কবিতা পড়ে শোনান : 'একটি নিড়িহা পাখি আমার বাগানে…'

বিনয় □ এই যে 'নিড়িহা' পাখি আমি লিখেছি এই 'নিড়িহা' শব্দটি জীবিত। আমি লেখার আগে শব্দটি ছিল না। শব্দটি বানাবার পরে, যেহেতু এটি একটি শব্দ, তাই সে জীবিত হয়ে উঠল।

সঞ্জয় □ কী করে এল শব্দটি ? ভিতরে ধ্বনিটি উচ্চারিত হল আর শব্দটিও তৈরি হয়ে গেল—এইভাবে ?

বিনয় □ আমি ইচ্ছে করেই ভাবলাম কী শব্দটি বসানো যায়, দেখলাম 'নিড়িহা' বলে একটি শব্দ বসাতে পারি যা পৃথিবীর কোথাও নেই —কোনো ব্যাকরণ দিয়েই তৈরি নয় এটা। এ হচ্ছে শব্দ তৈরির আরেকরকম পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতি। কিন্তু শব্দগুলি জীবিত। এবং 'নিড়িহা' শব্দটিও জীবিত।

সঞ্জয় □ শব্দের অর্থ ও তার শরীর—প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয়।

বিনয় □ কেন সম্ভব নয় ? পাখিদেরও অভিধান লেখা যায়। একটু কষ্ট করতে হয়। চিন্তা করতে হয়—পাখিরা কী-কী শব্দ বোঝে। ধর, তুমি খাও, পাখিরাও খায়। 'খাওয়া' ব্যাপারটি তাহলে পাখিরা বুঝতে পারে। পাখিদেরই ভাষায় বুঝতে পারে। 'খাওয়া' শব্দটি তাহলে পাখিদের অভিধানে আছে। এখন, চিন্তা জিনিসটা তো হল মনের মধ্যে নানারকম শব্দের নড়াচড়া—চিন্তা মানেই মনের মধ্যে শব্দের চলাচল। হয়ত, এক পৃষ্ঠারই একটি অভিধান হবে—তবু পাখিদের শব্দ ও বাক্য ইত্যাদি আছে।

সঞ্জয় □ কোনো-কোনো কবিতায় নির্দিষ্ট শব্দ না বসিয়ে আপনি লিখেছেন —বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ইত্যাদি। এটা কেন ?

বিনয় □ বহু কথা আছে যা গোপনীয়। এমন-এমন সব ব্যাপার আছে যা বলা যায় না, বলা উচিত নয়। গোপনে গোপনে রাখা ভাল। অথচ সেগুলো আমার মনে রাখতে হবে। সেই জন্য এমন একটা ভাষা সৃষ্টি করেছি যাতে পাঠক কিছু বুঝতে না পারে। অথচ এগুলো ছেপে রাখা দরকার, ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে।

'মাঘের বিকালবেলা জানালার কাছে বসে শুনি/অনেক বিশেষ্য ডাকে ওইখানে গাছে বসে উড়ে'—এই কবিতাটি বিনয়দাকে পড়ে শোনালাম।

বিনয় □ শব্দগুলি না দিলেও তুমি একটা মানে করে নিতে পারছ। তোমার

করা মানের সঙ্গে আরেক জনেরটা না-ও মিলতে পারে। তবু পাঠককে বলা হচ্ছে—ভেবে নাও।

এরপরে আরেকটি কবিতা পাঠ করে শোনালাম : 'শব্দ দিয়ে সাগরের গভীরতা আজো মাপা হয় / প্রশান্ত হৃদয়ে আমি বসে আছি, আমি ও কল্পনা…'

সঞ্জয় □ বিনয়দা, এই কবিতার প্রথম লাইনটা বিচ্ছিন্নভাবে ধরি তা যেন হয়ে ওঠে নিছক বিজ্ঞান-বিষয়ক একটি তথ্য, অর্থাৎ শব্দ এখানে 'সাউন্ড' যা সাগরের গভীরতা মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারি 'শব্দ' আসলে ওয়ার্ড—'সাগরের গভীরতা মাপা' বলতে শব্দের ক্ষমতার অমোঘতাকেই বোঝানো হয়েছে। একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বাক্য থেকে অনুভূতি অন্য দিকে চলে যায়—

বিনয় □ সাহিত্যের দিকে চলে যায়। জিনিসটার যেন মনুষ্যীকরণ ঘটে যায়। তুমি একেবারে হুবহু সত্যি কথা বলেছ। আমি ঠিক এই-এই ভেবেই কবিতাটি লিখেছি। একই বাক্যে সাগরের গভীরতা মাপা সম্বন্ধেও লিখেছি এবং শব্দ দিয়ে আমার সম্বন্ধেও লিখেছি। একই বাক্যের দুই মানে। শব্দবিন্যাস, বাক্যবিন্যাস ইত্যাদি বহু ব্যাপার আছে। অত সোজা নয়, বুঝলে? অনেক কাণ্ডই এর ভিতরে আছে।

সঞ্জয় □ সেগুলোই একটু বলুন না।

বিনয় □ সেগুলো বলার দরকার নেই। তুমি অন্য কথা শোনো—

'বর্তমানে সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্রপতি লিওনিদ ব্রেজনেভ
এককালে সৈনিক ছিলেন
বিশাল বিস্তীর্ণ দেশ পৃথিবীর কামিনী শেফালি জুড়ে আছে
পৃথিবীর মানচিত্র দেখে আমি সোভিয়েত দেশকে চিনেছি
সোভিয়েত দেশের সব নরনারী সাদারঙা আর
তাদের গড় আয়ু হল রঙ্গন বছর…'
…
'হে আমার বন্ধুজীবি
রজনীগন্ধা সমুদ্রের পারে আমি তোমাদের দেশে কখনো যাইনি'

বিনয় □ এগুলো তুমি পড়নি না?

সঞ্জয় □ না।

বিনয় □ এগুলো লিট্‌ল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে। তারপরে—

'ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি গন্ধরাজ গ্রহণের পরে
ভবিষ্যতে ভারতের রাষ্ট্রপতি জাতি হতে পারেন হয়তো—'

এগুলি আমার রাষ্ট্রপতিদের নিয়ে লেখা কবিতা। এমনভাবে লিখতে হবে যাতে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ না হন, যাতে মানহানি না ঘটে। তাহলে তো একেবারে সর্বনাশ ঘটে যাবে। এইসব ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম যে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিই কবিতাগুলি। প্রথমে লিখলাম : 'হে আমার বন্ধুজীব / অতলান্তিক সমুদ্রের পারে আমি তোমাদের দেশে কখনো যাইনি।' তারপরে পনেরো মিনিট পায়চারি করে এসে 'অতলান্তিক' কেটে লিখলাম 'রজনীগন্ধা'। তাহলে বল, এই যে ফুল বসিয়ে-বসিয়ে এ প্রকারের কবিতা লেখা—এটা আমার নিজস্ব পদ্ধতি কিনা? এরকম তেরোটা পদ্ধতি আমি একাই আবিষ্কার করেছি। আমার কবিতাতেই সমস্ত রয়েছে। মনোযোগ দিয়ে যদি পড় এবং আমার কবিতাসংগ্রহ ছাপা হয় যদি জানতে পারবে। এখন বল, লোকে কি ভবিষ্যতে স্বীকার করবে যে বিনয় মজুমদার নামে এক ইঞ্জিনিয়ার কবিতা লেখার তেরো রকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল?

সঞ্জয় □ আমার মনে হয় নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

বিনয় □ স্বীকার করবে তুমি বলছ? এখনো বানাতে পারি। কিন্তু কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছি, আর লিখব না।

এরপরে বিনয়দা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। আলাপচারিতা বন্ধ হয়ে থাকে। খোলা জানালা দিয়ে তাঁর দৃষ্টি তৎক্ষণে বাইরে দূরে প্রসারিত। দৃশ্যাবলী তাঁর কাছে ধরা দিতে থাকে। কবিতার পংক্তিতে নীরবতা ভাঙেন :

এইখানে মাটির পরে এক নারিকেল গাছ গজিয়ে উঠেছে
নারিকেল গাছটির কাছে পাখি নেই গরুও তো নেই দেখি
গাছের নিকটে
কয়টি মানুষ হেঁটে চলে যায় একটি মানুষ বসে আছে ঐ
বারান্দার 'পরে
এখন আকাশে সূর্য মধ্যাহ্নকালে রাত্রে তারারা সব উঠবে নিশ্চয়
মৃত্তিকা ও গাছ আর পশু আর পাখি আর মানুষ এবং...
তারাগুলি সূর্যদেব এইসব জীবিত ও চিন্তাশীল
এবং চলনক্ষম শব্দের সাহায্যে আমি কবিতাটি রচনা করেছি···

বিনয় □ এইবার কবিতা আলোচনা বন্ধ কর, অন্য কিছু বল। কারণ আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে নিজের বিশেষ কিছু বলা উচিত নয়। কোনো কারণেই উচিত নয়। তুমিও কবিতা লেখ। তোমার কাছে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'কীভাবে লিখেছেন মশাই?' তাহলে কেমন লাগবে? দেখ ভেবে-চিন্তে। আমি কীভাবে লিখেছি তা অতি গোপন ব্যাপার। শুধু বলতে পারি জীবিত, চিন্তাশীল ও

চলনক্ষম শব্দসমূহের সাহায্যেই আমি কবিতা লিখেছি। তোমরা জিজ্ঞাসা করছ বটে কিন্তু আর বিশেষ কিছু বলা উচিত নয়। কেন না, কবিতা লেখাটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

সঞ্জয় □ কবিতা লেখা বন্ধ করার কথাটা আপনি বারবার বলছেন। সেদিনও বলছিলেন—লেখার চেয়ে মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, কথা বলা এসবই বেশি ভাল লাগছে আপনার। কিন্তু এও বলেছিলেন

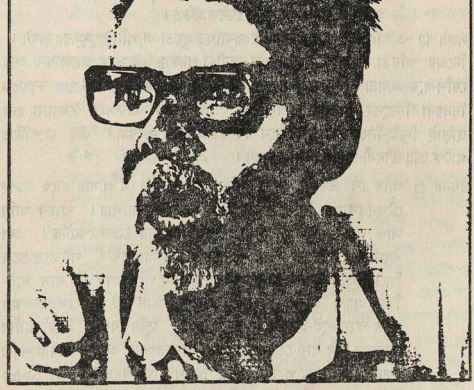

—সকলেরই কিছু একটা কাজ করতে হয়, তেমনই কবিতা লেখাটাও আপনার একটা কাজ। এ কাজ না করে আপনি আর কী করবেন—বা ধরুন চলনক্ষম শব্দের যে জগতের কথা আপনি বললেন—তাকে এড়িয়েই বা থাকবেন কী করে?

বিনয় □ কী জানি, আমার মন কেন যেন বলছে আর লেখা উচিত নয়। মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে / ভাবি যে 'আমার তৈরী কুকুর ডাকতো'। কবিতাটি পড়ে শোনানোর পর আবার কথোপকথন শুরু হয়।

বিনয় □ যে কথাগুলো লিখেছি, তুমি পড়ে শোনালে, সব সত্যি। অর্থাৎ কুকুর আমি সৃষ্টি করিনি, কুকুর অন্যের সৃষ্টি—সেই কথাটাই ওই ভাবে লেখা হয়েছে।

সঞ্জয় □ তাহলে 'আমার তৈরি কুকুর' কেন বললেন ?

বিনয় □ সেটা তো জিজ্ঞাসা করে বোঝা গেল।

সঞ্জয় □ আপনি দশ পর্যন্ত গুণে অপেক্ষা করছেন কেন ?

বিনয় □ আজ রাত্রেও হয়ত আবার অপেক্ষা করব—যদি ডাকে, যদি ডাকে—

সঞ্জয় □ কেন ?

বিনয় □ কুকুরের স্রষ্টা কে—আমি না অন্য কেউ সেটা বোঝবার জন্য আমি বলি 'কুকুর, একবার ডাক তো— ।' কুকুর ডাকে না।
কিন্তু যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি যদি বলতেন, 'কুকুর, ডাক্ তো' —অমনি সঙ্গে-সঙ্গে কুকুর ডেকে উঠত।

সঞ্জয় □ ও, আপনার কথায় ডাকলে প্রমাণিত হতো আপনিই কুকুরের স্রষ্টা।

নিজের কবিতা সম্পর্কে বলতে তাঁর অনীহা থাকায় এই সূত্রে আলোচনা আর বেশি দূর এগোয় না। প্রসঙ্গান্তরে যাবার অভিপ্রায়ে দু-একটি প্রশ্ন করতেও বিনয়দা নিরুত্তর থাকেন। কিছুটা আত্মমগ্নও। একসময় কোনো প্রশ্ন ছাড়াই নিজে-নিজে কথোপকথনে ফিরে আসতে থাকেন। এই অংশটিতে থাকে তাঁর জীবনী-প্রসঙ্গ, স্মৃতি-চারণ।

বিনয় □ আমি যে এখনো বেঁচে আছি এবং তোমরা যে আমার কাছে এসেছ টেপ-রেকর্ডার নিয়ে, সেটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ আমি সাত বার পাগলাগারদে থেকেছি, চারবার জেল খেটেছি। এবং একবার দেশত্যাগ করে পালাতে হয়েছে আমাকে। পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম পূর্ববঙ্গে। কারণ, যেদিন পালালাম তাঁর মাস দুই-তিন আগে আমার বাঁ-চোখ এবং বাঁ-কান নষ্ট করে দেওয়া হয়। চোখ-কান দুই-ই আমার ভাল ছিল। তুমি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যদি যাও তো খোঁজ নিয়ে দেখতে পার, আমার আমার শরীর কেমন ছিল তা পরীক্ষা করে লিখে রাখা আছে। সেটা ১৯৫৩ থেকে ৫৭ সালের মধ্যবর্তী সময়। তখন চোখ-কান সবই আমার ভাল ছিল। কিন্তু কলকাতাতেই পরে লোকে ধরে আমার বাঁ-চোখ আর বাঁ-কান নষ্ট করে দিয়েছিল। তার দু-তিন মাস পরে কাউকে না জানিয়ে, পাসপোর্ট ছাড়াই চলে গেলাম পূর্ব-পাকিস্তানে। গিয়ে উঠলাম পৈতৃক গ্রামে। সেটা ১৯৬৬ সাল, আমার বত্রিশ বছর বয়স। ওখানকার সমবয়সী মুসলমান যুবকেরা দিব্যি আদর-আপ্যায়ন শুরু করে দিল। তারা বড়ি-ফড়ি কিছু খাওয়াতেও

এল না। ইনজেকশনও দিতে এল না। তোফা ছিলাম! ভোরবেলা একজনকে ইংরেজি পড়াতাম, দুপুর বেলায় শেখাতাম অঙ্ক। আর রাত্রিবেলা চার-পাঁচ জনকে পড়াতাম—ক-খ-গ-ঘ থেকে শুরু করে ক্লাস নাইনের পড়া পর্যন্ত। বাকি সময়টা আড্ডা মেরে বেড়াতাম। এই হচ্ছে আমার জীবন কাহিনী।

আর ভারতবর্ষে আমাকে সাতবার পাগলাগারদে পোরা হয়েছে। অনেকেই তো পাগলাগারদে ছিলেন। তাঁদের জীবনীতে তা লেখা হয় না। আর আমার জীবনী লিখতে গেলে প্রথম বাক্যই লেখে—'গোবরা মানসিক হাসপাতালে ছিলেন…'। পাগলাগারদে আর কে-কে ছিলেন শুনবে? লুম্বিনী পার্কে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক। এঁদের জীবনী যখন লেখে তখন তো এসব একথা এভাবে লেখে না যে এঁরা পাগলা-গারদে ছিলেন। অথচ আমার ক্ষেত্রে প্রথমেই ওই কথা—'মানসিক হাসপাতালে ছিলেন…'।

পূর্ব-পাকিস্তানে পালিয়ে থাকার সময় একদিন নিজেই হাজির হলাম পুলিশের কাছে। ওদের বললাম, 'আমাকে আর ভারতবর্ষে ফিরে যেতে বলবেন না। যদি দরকার হয়, আমি মুসলমান হয়েই থাকব এইখানে যেখানে আমার বাবা-মা জন্মেছিলেন। কিন্তু ভারতে আর ফিরতে বলবেন না আমাকে।' ঢাকা থেকে গোয়েন্দা এল। আমাকে বলল, 'কবিতা লেখেন নাকি? কাগজ দিচ্ছি, লিখুন দেখি কী কবিতা লেখেন।' ফোটো তুলল আমার। সামনে, দুই পাশে, চুল-দাড়ি সহ, চুল-দাড়ি কামিয়ে ইত্যাদি নানাভাবে ফোটো তোলা হল। এইসব আমার জীবনে ঘটেছে। পুলিশ আমার অনুরোধ শুনে বলল, 'তা কি হয়? আমাদের আইন মোটে একটাই। কেউ যদি বর্ডার পেরিয়ে ঢুকে পড়ে তো তাকে তার মূল দেশে ফেরত পাঠানো হবে।' ছাপা আইন তো আর অমান্য করা যায় না! সত্যি-সত্যিই তারা আমাকে বনগাঁ সীমান্ত পর্যন্ত ফেরত দিয়ে গেল। বলল, 'যান, আমাদের দেশে আর আসবেন না, দ্বিতীয়বার যদি আসেন তবে ভয়াবহ শাস্তি পাবেন।'

সঞ্জয় □ তাও বিনয়দা, কলকাতায় না থেকে এখানে আছেন—এটা অনেক ভাল

বিনয় □ আমার বাবা আমাকে বলে গেছেন—'তুই এই ঘরে থাকবি।'

সঞ্জয় □ এখানকার ছেলেদের সঙ্গে আপনার আড্ডাটাও ভাল হয়।

বিনয় □ কোথায়? কেউ আসে না। ওরা তো চাকরি-বাকরি নিয়ে ব্যস্ত—আমি একেবারে ফাঁকা-একা পড়ে থাকি।

দিলীপ □ বিনয়দা, মনে রাখার মতো সিনেমা কী দেখেছেন—

বিনয় □ একটা ছবি দেখেছিলাম—'মিরাকল্ ইন মিলান'। ডি সিকার ছবি। ১৯৫২ সালে ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল কলকাতায়। 'মিরাকল্ ইন মিলান' দেখে মনে হয়েছিল এটা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। সেই সময় গড়ের মাঠেও কিছু ছবি দেখানো হয়েছিল। তার টিকিট লাগতনা। আগ্নেয়গিরি নিয়ে তোলা একটা ছবি দেখেছিলাম—'ফুজিয়ামা'। ধূসর রঙের লাভা বেরিয়ে আসছে। গাছ-পালা সঙ্গে-সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—এত উত্তাপ। নিচের দিকে গড়াতে-গড়াতে চলেছে সেই লাভা। অদ্ভুত দৃশ্য। এত বড় সব বৈজ্ঞানিক, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ছবি সব উড়োজাহাজের থেকে তুলে ফেলেছে তারা। তাই নিয়ে সিনেমা করেছে। □

যোগসূত্রের পক্ষে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী। ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়